সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

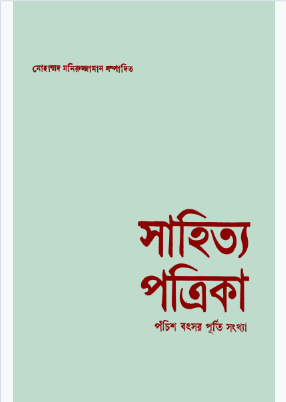

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

আট বছর আগের এক বিস্ময়কর মৃত্যু

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Clinton B. Seely
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.9
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.9
Pages	163-172
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আট বছর আগের এক বিস্ময়কর মৃত্যু

ক্লিন্টন বি. সীলি

'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি তখনকার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-পত্রিকা 'কবিতা'য় চৈত্র ১৩৪৪-এ প্রকাশিত হয়েছিল।[১] জীবনানন্দ দাশ সেই সময় তাঁর জন্মস্থান বরিশালে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন, সন্ততি ছিল, ব্রজমোহন কলেজে চাকুরীও ছিল। এর আট বছর আগে তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজ থেকে তাঁর প্রিয়তমা মাতৃভূমি রূপসী বাংলাদেশে ফিরে এসেছিলেন। এরকম এক পরিস্থিতিতে উপরোক্ত বিখ্যাত কবিতাটি তিনি ছাপতে দিয়েছিলেন।

কবিতার বিষয়বস্তু অত্যন্ত সহজ—একজন লোক আত্মহত্যা করে। তবে আত্মহত্যার কারণ স্পষ্টভাবে বোঝা যায় না। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে যা পেতে চেয়েছিলো তা পেয়েছিল কি না, তাও আমরা জানতে পারি না। কবিও তা জানেন না। কিন্তু কবিতায় কথা বলতে বলতে তিনি আত্মহত্যা করাকে খানিকটা সমর্থন করেন। যদিও শেষ স্তবকে কবি এর বিপরীত ভাবের প্রকাশ করেন তবুও মনে হয় তিনি নিজেও কিছুটা অনিশ্চিত। এবং তাঁর এই অনিশ্চয়তা কবিতার শেষ অবধি পাঠকের মন দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে।

জীবনানন্দের কবিতার সেই মানুষটির শুক্লপক্ষীয় পঞ্চমীর ফাল্গুনের অন্ধকারে মৃত্যু-বরণ করার বাসনা হয়েছিল। পরের দিন হচ্ছে ষষ্ঠী, দেবতা ষষ্ঠীর দিন। জীবনানন্দ ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন, হিন্দু নয়। কিন্তু কবি কোনক্রমেই হিন্দুধর্মের আচার সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন না।[২] ষষ্ঠী শিশুদের দেবতা। তিনি নবজাতককে সৃষ্টিও করেন পালনও করেন। কবিতার পূর্বোক্ত মানুষটি একটি নতুন জীবন সৃষ্টির জন্যও হয়তোবা আত্মহত্যা করেছিল।[৩] সে নতুন জীবনে প্রত্যাগমন করতে চাইতেও পারে, মানুষ-রূপে নয়, অন্য কোনভাবে। 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের-মানুষের সাথে তার হয় নাকো দেখা/এই জেনে,' বোধহয়, সে তার মনুষ্য জীবনকে শেষ করে নেয়া স্থির করে।

যে গাছে লোকটি নিজেকে দড়ি দিয়ে ঝোলাতে যাচ্ছে সেটা অশ্বত্থ গাছ। সে গাছ আবার বুদ্ধদেবের সঙ্গে জড়িত। একদিন সিদ্ধার্থ গৌতম যখন তাঁর বয়স মাত্র পঁয়ত্রিশের মতন তখন তিনি পৃথিবীতে শোকের উৎস খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত অনশনব্রতের সংকল্প করেন। একটা অশ্বত্থ গাছেরই নিচে তিনি অনশনব্রতী হয়ে বসেন। মার নামে দুষ্কৃত অসুর তাঁর ইন্দ্রিয়বাসনা জাগাবার চেষ্টা করে। তবে গৌতম তাঁর সাধনায় অবিচল থাকেন। অবশেষে অনেক দিনের ধ্যানের পর তিনি জানতে পারলেন ইহলোক দুঃখ-শোকময় কেন, এবং তা থেকে মুক্তি পেতে গেলে, মানুষের কি কর্তব্য। যে মুহূর্তে জানলেন সেই মুহূর্তেই তিনি বুদ্ধ হয়ে যান।

এক পরিপ্রেক্ষিতে 'আট বছর আগের একদিন' হচ্ছে জীবনানন্দের ব্যক্তিগতভাবে পুনর্নির্মাণ করা একটা বুদ্ধের গল্প। কবিতায় বুদ্ধের মতন চরিত্রটি কিছু একটা মানসিক কষ্টে ভুগেছিল। এমনও হতে পারে যে কয়েক বছর ধরে সে শান্তভাবে ঘুমোতে পারেনি।

বরঞ্চ তাকে 'জাগিবার গাঢ় বেদনার/অবিরাম—অবিরাম ভার' সইতে হয়েছিল। তদুপরি একটা অস্পৃশ্য কিছু ভিতরে রয়ে গেছে যে তাকে 'ক্লান্ত করে/ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।' এই যন্ত্রণার উৎস খুঁজে বার করতে হয়। অসুরের নাম কবিতায় না থাকলেও সে এই বুদ্ধ ধরনের চরিত্রকে প্রলুব্ধ করেছিল। মানুষটির স্ত্রী ছিল, শিশু ছিল, ভালবাসা, আশা-ভরসা ছিল। তার শারীরিক সুখের অভাব ছিল না। জীবনের স্বাদ সে চেখেছিল, হেমন্তের বিকালের সুপক্ক যবের ঘ্রাণ শুঁকেছিল। তাহলেও সে আত্মহত্যা করতে পারে। শেষ সেই অশ্বত্থ গাছের নিচে--মানে বোধি গাছের নিচে--সে বুঝেছিল ইহজগতের শোক-কষ্ট উত্তীর্ণ হতে গেলে মানুষের কর্তব্য কি। সে তখন পুরোপুরি বুদ্ধ হয়ে যায়, সে তখন মরে যায়।

অশ্বত্থ গাছটা—যাকে জীববিজ্ঞানে 'ফিকস্ রেলিজিওসা' অর্থাৎ ধর্মীয় ফিকস্ গাছ বলে—বৌদ্ধ ছাড়া তার অন্য ধর্মীয় বা তাত্ত্বিক তাৎপর্যও আছে। একটা বাংলা অভিধানে অশ্বত্থের এই অর্থ আমরা পাই: অবিরোধি—চিরকাল থাকা, অর্থাৎ যে বৃক্ষ শালবৃক্ষের মত বহুকাল অবিরোধে বাঁচিয়া থাকে।[৪] আরেকটা অভিধানে একই অর্থ পাওয়া যায় এবং উপরন্তু আমরা পাই এই অর্থ: সংসার বৃক্ষ।[৫] তার মানে: ইহলোকের প্রতীক। দ্বিতীয় অর্থ 'কঠ-উপনিষদে' ও 'ভগবদ গীতা'য় দেখা যায়। 'ভগবদ গীতা'র পঞ্চদশম অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে অশ্বত্থের উল্লেখ আছে। প্রথমটিতে ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলায় আমরা পড়ি: 'তারা অক্ষয় অশ্বত্থ তরুর কথা বলে, ...' 'যে স্বামীজী ইংরেজি অনুবাদ করেছেন তিনি আবার টীকায় ব্যাখ্যা করে এই শ্লোকটি বুঝিয়ে লেখেন: 'অশ্বত্থ কথাটির অর্থ হল যেরকম কালকে ছিল আজকে তেমন নয়। অশ্বত্থ শব্দ প্রয়োগে সংসার বা লৌকিক অস্তিত্বকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই বৃক্ষ অক্ষয় কিন্তু পরিবর্তনশীল ও চঞ্চল।'[৬]

'আট বছর আগের একদিন'-এর মানুষটি সেই সংসারের গাছের কাছে গিয়ে নিজেকে ফাঁসি দেয়। যে গাছ অক্ষয় হলেও নিত্য রূপান্তর হতে থাকে সেটার সঙ্গে নিজেকে দড়ি দিয়ে যুক্ত করে। পাঠক ও কবি, দুজনে ঠিকভাবে নাও জানতে পারেন, সেই মানুষটির জীবনও অক্ষয়, কেবল রূপান্তরিত হয়ে যায়। হয়তো মানুষের রূপে নয়—'হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, /হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে/ কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন'[৭] সে অন্য একরূপ ধারণ করে এই পৃথিবীতে ফিরে আসতেও পারে, তবে নিশ্চিতভাবে বলা যায়না।

প্রায় দেড় বছর আগে জীবনানন্দ অশ্বত্থ গাছকে নিয়ে একটা কবিতা, 'কবিতা' পত্রিকায় ছাপতে দিয়েছিলেন। তাতে একটি অশ্বত্থ গাছ কথা বলতে পারে, নিজের মতামত প্রকাশও করতে পারে।

বলিল অশ্বত্থ সেই

বলিল অশ্বত্থ ধীরে: কোন্ দিকে যাবে বলো—
তোমরা কোথায় যেতে চাও?
এত দিন পাশাপাশি ছিলে, আহা, ছিলে কত কাছে;
ম্লান খোড়ো ঘরগুলো—আজো তো দাঁড়ায়ে তারা আছে;
এই সব গৃহ মাঠ ছেড়ে দিয়ে কোন্ দিকে কোন্ পথে ফের্
তোমরা যেতেছো চ'লে পাই নাকো টের!
বোচকা বেঁধেছো ঢের,—ভোলো নাই ভাঙা বাটি ফুটো ঘটিটাও;
আবার কোথায় যেতে চাও?

পঞ্চাশ বছরও হয়নিকো,—এই-তো সে-দিন
তোমাদের পিতামহ, বাবা, খুড়ো, জেঠামহাশয়
—আজও, আহা, তাহাদের কথা মনে হয়!—
এখানে মাঠের পারে জমি কিনে খোড়ো ঘর তুলে
এই দেশে এই পথে এই সব ঘাস ধান নিম জামরুলে
জীবনের ক্লান্তি ক্ষুধা আকাঙ্ক্ষার বেদনার শুধেছিলো ঋণ;
দাঁড়ায়ে-দাঁড়ায়ে সব দেখেছি যে,—মনে হয় যেন সেই দিন!

'এখানে তোমরা তবু থাকিবে না? যাবে চ'লে তবে কোন্ পথে?
সেই পথে আরো শান্তি—আরো বুঝি সাধ?
আরো বুঝি জীবনের গভীর আস্বাদ?
তোমরা সেখানে গিয়ে তাই বুঝি বেঁধে র'বে আকাঙ্ক্ষার ঘর!···
যেখানেই যাও চ'লে, হয় নাকো জীবনের কোনো রূপান্তর;
এক ক্ষুধা এক স্বপ্ন এক ব্যথা বিচ্ছেদের কাহিনী ধূসর
ম্লান চুলে দেখা দেবে যেখানেই বাঁধো গিয়ে আকাঙ্ক্ষার ঘর।'
বলিল অশ্বত্থ সেই ন'ড়ে অন্ধকারে মাথার উপর। ৮

সেই অক্ষয় সংসারের অশ্বত্থ গাছ অনেকের জীবন পালটে যেতে দেখে। তাদের পূর্ব-পুরুষের জন্ম ও মৃত্যু হয়েছিল তাঁর চোখের সামনে। তারপর সেখানকার কয়েকজন বাসিন্দা আরো শান্তি, জীবনের আরো গভীর আস্বাদের খোঁজে যাবার উদ্যোগ করছিল। উলটো একটা খোঁজে জীবনানন্দ তিরিশের দশকের গোড়ায় বরিশালে ফিরেছিলেন। তাই জীবনানন্দ অশ্বত্থের বোধ ভাল করে বুঝতে পারেন। যারা প্রত্যাশা নিয়ে অন্য কোথাও আরো শান্তিপূর্ণ, আস্বাদময়, সুখী জীবনকে খুঁজতে যাচ্ছে তিনি সেই অশ্বত্থ গাছ হয়ে তাদেরকে তাঁর অভিজ্ঞতা থেকে হুঁশিয়ারি এবং একটু-আধটু প্রতিবাদও জানান। অন্য একদিন যখন আরেকজন মানুষ এই জীবন থেকে অন্যত্র যাবার জন্য একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের শাখার কাছে আসবে তখন সেই গাছটি আবার প্রতিবাদ করবে।

মৃত্যু সম্বন্ধে জীবনানন্দ সর্বদা বিস্মিত এবং সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্টচিত্ত। 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়, বাংলাদেশে উপভোগ করার মত যা-যা আছে গুণে বলার পর, তিনি শেষ স্তবকে প্রশ্ন করেন আর উত্তরও দেন: 'আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানি না কি আহা,/·········/কি বুঝিতে চাই আর; রৌদ্র নিভে গেলে পাখ-পাখালির ডাক / শুনি নি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখি নি কি উড়ে গেছে কাক!' সব শোনার মতন ও দেখার মতন জিনিশ যারা শুনে ও দেখে ফেলেছে তাদের এই পৃথিবী থেকে প্রস্থান তেমন আপসোসজনক নয়। তারা যেতে মোটামুটি প্রস্তুত বলে কবি বলে গেছেন। তবে যা বলেছেন তা সত্যি সত্যি বিশ্বাস করেন কি? আমার মনে হয় না।

'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদী কবিতাবলী জীবন-মৃত্যুর চিন্তায় ভরতি। ঐ সব কবিতায়, মনে হয়, জীবনানন্দ এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বা দেয়ার চেষ্টা করছেন: মৃত্যুর পরে কি বাংলাদেশকে উপভোগ করা যায়? তিনি তাই আশা করেন—

ঘুমায়ে পড়িব আমি একদিন তোমাদের নক্ষত্রের রাতে;
···　　···
যখন হলুদ বোঁটা শেফালির কোনো
এক নরম শরতে

ঝরিবে ঘাসের প'রে—শালিখ
খঞ্জনা আজ কত দূর ওড়ে—
কতো খানি রোদ মেঘ—টের পাবো
শুয়ে-শুয়ে মরণের ঘোরে।[১০]

'আট বছর আগের একদিন'-এ তিনি একই জিজ্ঞাসা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন। তবে সেই কবিতায় মৃত্যুর পরে কি হবে, সে সম্বন্ধে বিবেচনা করেন নি। বরং আত্মহত্যার প্রেরণা কোত্থেকে আসে এবং একজন মানুষ তার নিজের মৃত্যুকে বাছাই করে কেন, এই ক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য।

এক বন্ধুর অকাল মৃত্যুর পরে জীবনানন্দ শ্রাদ্ধ-ভাষণে মৃত্যু সম্পর্কে লিখেছেন: 'মৃত্যু যেন জীবনেরই আর এক ফিরতি।' কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি দ্বিধাও করেন। একই ভাষণে মন্তব্য করেন যে যতদিন আমরা বেঁচে আছি সব সময় মৃত্যু সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল থাকবেই। মৃত্যু এমন একটা জিনিশ তা নিয়ে কোন মানচিত্র, কোন 'টাইম-টেবিল' তৈরী করা চলে না। লেখেন, ওপারে গিয়ে সুখে দেখে আসতে পারি না, কতগুলো 'মার্কিন টুরিস্ট' এর মতন।[১১]

প্রাকৃতিক জগতে মানুষ, বুঝি, একমাত্র জীব যে হাসতে পারে। মানুষও একমাত্র প্রাণী যে ইচ্ছে করেই নিজের জীবনকে হনন করতে পারে। বুড়ি পঞ্চমীর চাঁদ ডুবে যাওয়ার পরে ওই ঘন অন্ধকারে থুড়থুড়ে অন্ধ প্যাঁচা জাগ্রত, জ্যান্ত। তার নিজের জীবনকে বাঁচাতে সে উৎসুক। ব্যাং, গলিত স্থবির হলেও, জীবনের আর দুয়েকটা মুহূর্তের জন্য, আরেকটা প্রভাতের উষ্ণতার জন্য ভিক্ষা করে। মশাও, তার বৌদ্ধ সংঘারামের মত আঁধারে অর্ধ-জীবিত ধ্যানস্থ না হয়ে, জীবনের রক্তের স্রোতকে ভালবাসাতে জেগে থাকে। মাছি, নোংরা জায়গায় বসে থাকতে হলেও, রৌদ্রে আবার ওড়ে, জীবনকে ভালবেসে ওড়ে। জীবনকে ভালবাসে বলে ফড়িঙও মরণের সাথে লড়াই করে।

জীবন যদি এই তুচ্ছতর জীবগুলোর কাছে এতো মূল্যবান হয় তাহলে সেই মানুষটি তার জীবন মূল্যহীন বলে মনে করে কেন? কবি তাকে জিজ্ঞেস করতে চাইছেন: অন্য জীব কি তোমার অপ্রকৃতস্থ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নি? অশ্বত্থের শাখা কি করে নি—যে ভাবে অশ্বত্থ গাছ করেছিল, যারা পৈত্রিক বাসভিত্তি ছেড়ে চলে যাচ্ছিল, তাদের কাছে, 'বলিল অশ্বত্থ সেই' কবিতায়? জোনাকিগুলো কি অন্ধকারে আলো দেখায় নি? আর প্যাঁচা কি তোমাকে চিৎকার করে বোঝায় নি যে অন্ধকার হলেও জীবন টিকিয়ে রাখা যায়, অন্ধকার থাকার ফলেই জীবন-সমর্থন করার ইঁদুরকে ধরা যায়?

কবিতার মাঝখানে জীবনানন্দ প্রথমপুরুষ সর্বনামের বদলে আরো ঘনিষ্ঠ মধ্যমপুরুষ সর্বনাম ব্যবহার করেন। যে বাক্যে মধ্যমপুরুষ সর্বনাম প্রথমে দেখা দেয় সে বাক্যের প্রথম শব্দও 'ঘনিষ্ঠ'। ঘনিষ্ঠতা থাকাতে মানুষটি ফাঁসির গাছের কাছে গেলে আমাদের ত্রাস-অনুভূতির বৃদ্ধি ঘটে। আমরা পাঠক হয়ে তাকে কথা বলেছি বলে তাকে এখন একরকম চিনি। মানুষে-গাছে মুখোমুখি দেখা হওয়ার কিছুক্ষণ পর জীবনানন্দ আবার লাশ ও লাশকাটা ঘরকে নিয়ে ব্যস্ত, আর সঙ্গে সঙ্গে ত্রাস-অনুভূতি কমে যায়। আরেকবার তিনি মধ্যমপুরুষ ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন তবে তখন আমাদেরকে বলছেন, আত্মহত্যাকারীকে নয়। সেই চরিত্রকে নিয়ে তারপর থেকে প্রথমপুরুষ ব্যবহৃত হয়ে যায়।

ক্রমশঃই একটু আবেগশূন্যভাবে আত্মহত্যার কারণের উপরে ভাবনা করার পর জীবনানন্দ আবার প্যাঁচার কথা তোলেন। রোজ রাতে ওই প্যাঁচা, চোখে দেখতে পায়না, বয়সও হয়েছে, তবুও আশান্বিত, বেঁচে থাকা সম্বন্ধে যত উৎসাহী ছিল তত সে এখনো। হয়তো অভ্যস্ত বলে সে তার উত্তেজনা চিৎকার করে জানায়। চন্দ্রাস্ত হয়ে যাবার পর আবার দু'একটা ইঁদুর ধরবে। ওই থুড়থুড়ে অন্ধ প্যাঁচাকে কবি জিজ্ঞেস করেন : আজো তোমার জীবন কি চমৎকার ? আমরা ধরে নিতে পারি সে 'হ্যাঁ, একশো বার হ্যাঁ,' বলবে। অন্ধ বৃদ্ধ বয়স অবধি সে বেঁচে থেকেছে। এখন সে ফাঁসির গাছে, বোধি গাছে, সংসার গাছে বসে আছে। আর এখনো সে জীবনের পক্ষপাতী। এই দেখে জীবনানন্দ আত্মহত্যাকে বাতিল করে আপাততঃ একটা প্যাঁচার মতন জীবন যাপন করতে চান। তিনি তাঁর নিজের জীবনকে হনন না করে না হয় জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার থেকে ভোজন করবেন। তিনি মরণের সাথে লড়বেন। যে লড়েনা সে ইঁদুরের মত মারা যায়। মানুষ বা যে-কোন জীব-জন্তুকে জীবনের ভাঁড়ারে সজোরে ভক্ষণ করতে হবে, প্যাঁচা যেমন করে। সেই মানুষটির সব কিছু ছিল—বউ, বাড়ী, শিশু ও প্রেম। তবে বেঁচে থাকতে সে লড়েনি, সে জীবনের ভাঁড়ারের জিনিশ তৃপ্তি করে খায় নি।

এই শেষ স্তবক সত্ত্বেও প্যাঁচার চেয়ে আত্মহত্যা ও তার সম্ভবপর কারণ জীবনানন্দের মনকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। বস্তুতঃ এই শেষ স্তবক ছাড়া সমস্ত কবিতার লক্ষ্য হচ্ছে এই আত্মহত্যার হেতু। সে কি কোন ভূত দেখে আত্মহত্যা করেছে ? বলা যায় না। তবে আরেকটা কারণ থাকতেও পারে, সেই লোকটার রক্তের ভিতরে, সবার রক্তের ভিতরে :

> আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
> আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে ;
> আমাদের ক্লান্ত করে
> ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;

কিছু একটা অস্পৃশ্য পদার্থ আছে যাতে মানুষের জীবন-তেজঃ নেভায়। তার ফলে ক্লান্তি হয়। জীবিত থাকলে ক্লান্তি থেকে যায়। শুধু মরণের ঘুম সেই ক্লান্তি কাটে। তবে অস্পৃশ্য পদার্থ যে কি, তা রহস্যাবৃত। কবিতাটি এক দিক থেকে 'বিপন্ন বিস্ময়'-এর উপরে নির্ভর করে। যখন মানুষটি অশ্বত্থ গাছের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে মুহূর্তে কাব্যের আবেগ সবচেয়ে প্রবল, নাটকীয় চূড়া বলা যেতে পারে। কিন্তু কবিতা জুড়ে প্রশ্নটা রয়েছে : আত্মহত্যা করেছে কেন ? প্রশ্নের জবাব মেলে বিপন্ন বিস্ময়। তবে বিপন্ন বিস্ময়টা কি ? দীপ্তি ত্রিপাঠীর মতে কথাদ্বয়ের মানে হচ্ছে সৃষ্টির যন্ত্রণা, 'বোধ' কবিতায় বোধের মত। 'এই বিপন্ন বিস্ময়—অর্থাৎ সৃষ্টির তাড়না মানুষকে অবসন্ন করে দেয়। 'বোধ' কবিতাতেও তিনি এই তাড়নার কথা বলেছেন।'[১২]

আরেকজন সমালোচক, রবীন্দ্রনাথ সামন্ত বিপন্ন বিস্ময় আর বোধের মধ্যে বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে বলে মনে করেন। তবে তাঁর মতে বিপন্ন বিস্ময় হচ্ছে যে-বোধ জীবনানন্দ অনুভব করতেন যখন মৃত্যুকে দেখতেন আর মৃত্যুর অদ্ভুত আকর্ষণ টের পেতেন।

> কবি মৃত্যুকেই বিস্ময়ের বোধে দেখেছেন। জীবনানন্দ প্রধানতঃ বিস্ময়-বোধের কবি। রোমান্টিক কবির মতো এই বিস্ময়বোধ ঘাস, ফুল, নক্ষত্র, নদী, নারীর মতো মৃত্যুকে ও মৃত্যুর আবরণ আকর্ষণকেও বড় বিস্ময়ের চোখে দেখেছেন।[১৩]

বিস্ময় জীবনানন্দের কাছে খুব প্রিয় কথা। তাঁর দুটো কবিতার শিরোনাম 'বিস্ময়'। তাছাড়া অনেক কবিতায় শব্দটি ব্যবহার করে গেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরবর্তী বর্ধিত সংস্করণে 'পাখি' নামে একটা কবিতা আছে যাতে 'আট বছর আগের একদিন'-এর সঙ্গে সামান্য মিল দেখা যায় :

পাখি

ঘুমায়ে রয়েছ তুমি ক্লান্ত হ'য়ে, তাই
আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ-বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এলো ;—তুমি জেগে নাই,

আমার বুকের 'পরে এই এক পাখি ;
পাখি ? না ফড়িং কীট ? পাখি না জোনাকি ?
বাদামি সোনালি নীল রোম তার রোমে-রোমে রেখেছে সে ঢাকি,
এমন শীতের রাতে এসেছে একাকী

নিস্তব্ধ ঘাসের থেকে কোন্
ধানের ছড়ার থেকে কোথায় কখন,
রেশমের ডিম থেকে এই শিহরণ
পেয়েছে সে এই শিহরণ !

জ্যোৎস্নায়—শীতে
কাহারে সে চাহিয়াছে ? কতোদূরে চেয়েছে উড়িতে ?
মাঠের নির্জন খড় তারে ব্যথা দিতে
এসেছিলো ? কোথায় বেদনা নাই এই পৃথিবীতে।

না—না—তার মুখে স্বপ্ন সাহসের ভর
ব্যথা সে তো জানে নাই--বিচিত্র এ-জীবনের 'পর
করেছে নির্ভর ;
রোম—ঠোঁট—পালকের এই মুগ্ধ আড়ম্বর।

জ্যোৎস্নায়—শীতে
আমার কঠিন হাতে তবু তারে হলো যে আসিতে,
যেই মৃত্যু দিকে-দিকে অবিরল—তোমারে তা দিতে
কেন দ্বিধা ? অদৃশ্য কঠিন হাতে আমিও বসেছি পাখি,
আমারেও মুষড়ে ফেলিতে

দ্বিধা কেহ করিবে না ; জানি আমি, ভুল ক'রে দেবেনাকো ছেড়ে ;
তবু আহা, রাতের শিশিরে ভেজা এ রঙিন তুলোর বলেরে
কোমল আঙুল দিয়ে দেখি আমি চুপে নেড়ে-চেড়ে,
সোনালি উজ্জ্বল চোখে কোন্ এক ভয় যেন ঘেরে

তবু তার ; এই পাখি—এতটুকু—তবু সব শিখেছে সে—এ এক বিস্ময়
সৃষ্টির কীটেরও বুকে এই ব্যথা ভয় ;
আশা নয়—সাধ নয়—প্রেম স্বপ্ন নয়
চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়

পৃথিবীতে ; এই ক্লেশ ইহাদেরো বুকের ভিতর ;
ইহাদেরো ; অজস্র গভীর রঙ পালকের 'পর
তবে কেন ? কেন এ সোনালি চোখ খুঁজেছিলো জ্যোৎস্নার সাগর ?
আবার খুঁজিতে গেল কেন দূর সৃষ্টি চরাচর ।[১৪]

পাখিটা মারা গেছে। জীবনানন্দ মধ্যমপুরুষ এবং প্রথমপুরুষ সর্বনাম দিয়ে তাকে ও তার সম্বন্ধে কথা বলেন। 'আট বছর আগের একদিন'-এ এরকম সর্বনামের পরিবর্তন আরো ফলপ্রদ ভাবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি। সেখানেও কবিকে মৃত্যুকে উদ্দেশ্য করে ও মৃত সম্বন্ধে কথা বলতেও দেখতে পাই। সেখানে একজন মানুষ নিজেকে হত্যা করেছিল, আর উপরোদ্ধৃত কবিতায় জীবটি শুধু মরেছে। এখানে জীবনানন্দ ঠিক মৃত্যুর কারণের প্রশ্ন না করেও এ বেদনাপূর্ণ পৃথিবীতে তার আগমনের হেতু সম্পর্কে ভাবেন। 'কাহারে সে চাহিয়াছে ? কতোদূরে চেয়েছে উড়িতে ?' আর 'কেন এ সোনালি চোখ খুঁজেছিলো জ্যোৎস্নার সাগর ?' যদি ভয় ব্যথা ভুগতে হয় তাহলে কেন বা আসে এই পৃথিবীতে ?

প্রথমে কবি ভেবেছিলেন এই পাখি, এই বোবা জীব, ক্লান্ত হয়ে সুখে মারা গেছে : 'আর সুখে স্বপ্ন সাহসের ভর···ব্যথা সে তো জানে নাই।' তারপর তিনি উপলব্ধি করেন যে মানুষের মত পাখিদের বুকেও ক্লেশ জন্মায়—রঙ্গিন পালক, সুন্দর দেখতে হলেও, ওই পালকের উপরে, বুকের ভিতরে ক্লেশ। এই সব নিয়ে মনের মধ্যে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জীবনানন্দ বিস্ময় অনুভব করেন।

'রূপসী বাংলা'র শেষ এবং একটি অচতুর্দশপদী কবিতায় বিস্ময় কথাটা আরেক পরিবেশেও দেখতে পাই :

একদিন কুয়াশার এই মাঠে আমারে
　　পাবে না কেউ খুঁজে আর, জানি ;
হৃদয়ের পথ-চলা শেষ হলো সেই
　　দিন—গিয়েছে যে শান্ত হিম ঘরে,
অথবা সান্ত্বনা পেতে দেরি হবে কিছু
　　কাল—পৃথিবীর এই মাঠখানি
ভুলিতে বিলম্ব হবে কিছু দিন ; এ মাঠের
　　কয়েকটা শালিখের তরে

আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে র'বো
　　কিছু কাল অন্ধকার বিছানার কোলে,
　　...　　...
আর সেই সোনালি চিলের ডানা—
　　ডানা তার আজো কি মাঠের কুয়াশায়
ভেসে আসে ;—সেই ন্যাড়া অশ্বত্থের পানে
　　আজো চ'লে যায় সন্ধ্যা সোনার মতো হ'লে ?

ধানের নরম শিষে মেঠো ইঁদুরের চোখ
নক্ষত্রের দিকে আজো চায় ?
আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে র'বো কিছু
কাল অন্ধকার বিছানার কোলে।[১৫]

এবং 'ক্যাম্পে' আমরা পাই :

কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমাকেও ডাকেনি কি কেউ এসে
জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
ওই যাই হরিণীর মতো ?[১৬]

বিভিন্ন প্রসঙ্গে জীবনানন্দ বিস্ময় কথাটা লাগিয়ে দিয়েছেন। কখনো কখনো সেই বিস্ময়ের মানে প্রকৃতির আতিশয্যের উপভোগের বোধ। কোন কোন সময় তার মানে মৃত-সুন্দর জীবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হর্ষে-বিষাদে কৌতূহলের বোধ।

আগে আমি বিপন্ন বিস্ময় সম্বন্ধে দীপ্তি ত্রিপাঠী ও রবীন্দ্রনাথ সামন্তর মতামত উল্লেখ করেছি। 'আট বছর আগের একদিন' এবং যে কতক জায়গায় 'বিস্ময়' শব্দটি পাওয়া যায় সেগুলো বিবেচনা করলে আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সামন্ত জীবনানন্দের প্রত্যাশিত অর্থ ধরেছেন : বিপন্ন বিস্ময় হচ্ছে মৃত্যুর ভয়াবহ অথবা অদমনীয় অবারণ আকর্ষণ।

শেষে 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদী কবিতার বিশেষ কয়েকটি চরণের সঙ্গে তুলনা করা যাক। এইগুলোতে এখন পরিচিত দৃশ্য ও চিরোপস্থিত মৃত্যুর অনুভূতি রয়েছে :

'''হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে
গা'বে তার গান,
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো
ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে
আকাঙক্ষার—তবুও তো চোখের উপরে
নীল মৃত্যু উজাগর—বাঁকা চাঁদ, শূন্য
মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—

কখন মরণ আসে কে বা জানে—
কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে
গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানিনাকো ;—তবু যেন মরি আমি
এই মাঠ—ঘাটের ভিতর,[১৭]

যদিও উপরোদ্ধৃত কবিতা-অংশের চেয়ে 'আট বছর আগের একদিন'-এর সূক্ষ্মতা ও গাম্ভীর্য অনেক প্রকট, তবুও মিল অস্বীকার করা সম্ভব নয়। আবার সেই মৃত্যুর চেতনা, আবার সেই প্যাঁচা জীবনের ভাঁড়ার থেকে ইঁদুরকে (কবিকে) কুড়িয়ে

নিচ্ছে। ইঁদুর যে জীবনকে কেড়ে খাওয়ার প্রতীক—'আট বছর আগের একদিন'-এ প্রকাশ্যভাবে এই ইঁদুর আত্মহত্যাকারীতে পরিণত হয়ে যায়। মানুষটি হয়ে গেছে 'রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো' আর 'খ্যাঁতা ইঁদুরের মতো'। বিস্ময়ের ভাব ও অশ্বত্থ গাছ অন্য কোন কবিতায় আছে, 'আট বছর আগের একদিনে'ও আছে। তবে 'আট বছর আগের একদিন' জীবনানন্দের সেরা কবিতার অন্যতম। কারণ, তাতে এই সব প্রতীক ও ভাবনা কবি নিপুণভাবে সাজিয়ে দিয়েছেন যাতে পাঠকের উপরে সব-চেয়ে প্রত্যক্ষ ফলাফল হয়। সেই ফলাফল এক কথায় বর্ণনা করতে গেলে বলতে হবে বিস্ময়কর।

তথ্যনির্দেশ

১. মূলতঃ এই নিবন্ধ আমার ইংরেজিতে লেখা পিএইচ.ডি. থিসেস থেকে নেয়া। আমি নিজে বাংলায় অনুবাদ করার পর আনিসুজ্জামান প্রমুখ দু'চার জন রচনাটি সংশোধন সম্পাদনা করেছেন। সে জন্য আমি তাঁদের কাছে ঋণী। যে-সব প্রমাদ ও ভুল বক্তব্য থেকে গেছে তার জন্য আমি পুরোপুরি দায়ী।

২. এ অস্বাভাবিক কিছু নয়। একজন লোক বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করাতে তার অন্ততঃ কিছু কিছু হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্বন্ধে না জানা সম্ভব নয়। ইদানিং বেলাল চৌধুরী আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, চিঠিতে জীবনানন্দ একবার পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়কে কোন প্রসঙ্গে লেখেন: 'আমি ঈদের চাঁদের মত খুশি'। তিনি অবশ্যই মুসলমান ছিলেন না।

৩. দীপ্তি ত্রিপাঠী মোটামুটি এই ধারণা ব্যক্ত করেছেন। 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়' (৩য় সং; কলকাতা: নাভানা, ১৯৬৪), পৃ. ১৮১

৪. জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,' দ্র. 'অশ্বত্থ'।

৫. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ,' দ্র. 'অশ্বত্থ'।

৬. *The Bhagavad Gita.* Translation and commentary by Swami Childhavananda Triuppaaittuai : Sri Ramakrishna Tapovanam, 1972), pp. 749-50

৭. জীবনানন্দ দাশ, 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসম্ভার,' রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত (৪র্থ সং; ঢাকা: খান ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং, ১৩৮১), পৃ. ১১৭

৮. ঐ, পৃ. ১৮৫

৯. ঐ, পৃ. ৭৮। 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি 'কবিতা'য় আশ্বিন ১৩৪২ সনে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। যে পাঠান্তর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে (১৩৪৩) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, সেটা 'কবিতা'র পাঠা-ন্তরের অপেক্ষায় অনেক পরিবর্তিত (এবং পরবর্তী 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় সে পাঠান্তর, এখানে ওখানে আরো পরিবর্তিত)। রবীন্দ্রনাথ 'কবিতা'র পাঠান্তর একটু সম্পাদনা করার পর (খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ নিজে সম্পাদনা করে গেছেন), তাঁর 'বাংলা কাব্য পরিচয়' (১৩৪৫) সংকলনে ছাপিয়ে ছিয়েছেন।

১০. জীবনানন্দ দাশ, 'কাব্য সম্ভার,' পৃ. ১১৬। শেষ চরণে রণেশ দাশগুপ্তর সম্পাদিত সংকলন 'পাবো'র জায়গায় 'পাবে' আমরা পাই।

১১. জীবনানন্দ দাশ, 'সুধীর কুমার,' 'স্মৃতি-তর্পণ'-এ, সম্পাদক অজ্ঞাত ([বরিশাল] : প্রকাশক অজ্ঞাত, [১৯৪২?],) পৃ. ১২৬-২৭। বরিশালের বাণীপীঠ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও জীবনানন্দের আত্মীয় রসরঞ্জন সেনের উপরে লেখা ও ওই ভদ্রলোকের নিজের রচনা গ্রন্থিত হবার জন্য এই বইয়ের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু সুধীরকুমার (১৩০৭-৪২, ১১ই আষাঢ়) এবং কমলা দত্তের উপরে লেখাও তার মধ্যে আছে। তাতে জীবনানন্দের দুটি প্রবন্ধ, একটা রসরঞ্জনের উপরে, অন্যটা সুধীরকুমার দত্ত সম্বন্ধে। বরিশালের শ্রীযুক্ত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সৌজন্যে দেখতে পেয়েছিলাম।

১২. দীপ্তি ত্রিপাঠী, 'আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়,' পৃ. ১৮২

১৩. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত, 'জীবনানন্দ-প্রতিভা' (কলকাতা: আল্‌ফা পাবলিশিং, ১৯৭২), পৃ. ৪৫

১৪. জীবনানন্দ দাশ, 'কাব্য সম্ভার,' পৃ. ৮৭-৮৮

১৫. ঐ, পৃ. ১৪৩-৪৪। জীবনানন্দের কবিতার খাতায় এ কবিতার (অশোকানন্দের সম্পাদিত 'রূপসী বাংলা'য় একটা কবিতা, রণেশ দাশগুপ্তর সম্পাদিত 'কাব্য সম্ভার' দুটো কবিতা হয়ে গেছে) শিরোনাম নেই। সেটা চতুষ্পদী হিশেবে লেখা। সর্বশেষ চতুষ্পদীর স্তবক তিনি 'আর সেই সোনালি চিলের ডানা—ডানা তার...' পর্যন্ত লিখে পাশে '২ / ৩ / ৪ / ১' সংখ্যাগুলো বসিয়ে দিয়েছিলেন। তা থেকে আন্দাজে বোঝা যায় যে তিনি দ্বিতীয় চতুষ্পদীর নতুন সাজানো পুনরুক্তি করতে চেয়েছিলেন। তাই অশোকানন্দ দাশ ওই ভাবে শেষ স্তবক সাজিয়ে দিয়েছেন। অশোকানন্দের সৌজন্যে কবিতার খাতা দেখতে পেয়েছিলাম।

১৬. ঐ, পৃ. ৪৫

১৭. ঐ, পৃ. ১২০